অধ্যায় ১ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

বিন্যাসক্রম

১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১.২ পরিচিতি
১.৩ জন্মখণ্ডের বিষয়বস্তু
১.৪ তাম্বুলখণ্ডের বিষয়বস্তু
১.৫ রাধাবিরহ পর্যায়ের বিষয়বস্তু
১.৬ কবি কৃতিত্ব
১.৭ চরিত্র-চিত্রণ
১.৭.১. রাধা
১.৭.২. কৃষ্ণ
১.৭.৩. বড়াই
১.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১.১০ অতিরিক্ত পঠন
১.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি —

- বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড ও রাধাবিরহের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিচিত হবেন।
- ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের কবি বড়ুচণ্ডীদাসের কবি-প্রতিভার পরিচয় পাবেন।
- ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের বিভিন্ন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত হবেন।

১.২ পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম এবং একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ। মধ্যযুগের আদিতম নিদর্শন হিসাবে বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যটিকে ধরা হয়। ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে কাব্যটি চৈতন্য-পূর্ববর্তী। ১৯০৯ সালে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) বাংলা সাহিত্যের জহুরী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রাম নিবাসী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়াল ঘরের মাচা থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুথিটি আবিষ্কার করেন। এর প্রায় দু-বছর পর, অর্থাৎ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে, বসন্তরঞ্জন পুথিটি বঙ্গীয় সাহিত্য

পরিষদে নিয়ে যান। তারও প্রায় পাঁচ বছর পরে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে তাঁরই সম্পাদনায় কাব্যটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের ভূমিকা লেখেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

১.৩ জন্মখণ্ডের বিষয়বস্তু

কংসের অত্যাচারে সৃষ্টির বিনাশ হচ্ছে। বসুন্ধরা/পৃথিবী আর তার পাপের বোঝা বহন করতে পারছে না। তাই স্বর্গের দেবতাদের কাছে তার দুঃখের কথা জানায়। দেবতাগণ সকলে মিলে আকাশে একটি সভার আয়োজন করেন কংসকে হত্যার উপায় নির্ধারণের জন্য। তখন সকলে মিলে ব্রহ্মার কাছে যান। ব্রহ্মা তাঁদের নিয়ে যান নারায়ণের কাছে। সমস্ত অভিযোগ শুনে নারায়ণ একটি সাদা ও একটি কালা কেশ দেবতাদের হাতে দিয়ে বলেন যে, এই দুটি কেশে বসুদেবের গৃহে দেবকীর উদরে বলরাম ও কৃষ্ণ রূপে জন্মগ্রহণ করবে। আর কৃষ্ণের হাতেই কংসের বধ হবে।

দেবতাদের এই মন্ত্রণা নারদ কংসকে জানালে কংস দেবকীর উদরে জন্ম হওয়া সমস্ত পুত্রকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। কংসের এই সিদ্ধান্ত নারদ বসুদেবকে জানিয়ে দেন আর সাবধানে থাকতে বলেন। কংস পরপর ছয়টি পুত্রকে হত্যা করেন। সপ্তম সন্তানের সময় গর্ভপাতের ছল করে শ্বেত কেশ রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত হয় এবং তা থেকে বলরামের জন্ম হয়। আর ভাদ্র মাসের অষ্টমী তিথিতে বর্ষণমুখর অন্ধকার রাতে কৃষ্ণের জন্ম হয়। বসুদেব কৃষ্ণকে গোকুলে যশোদার ঘরে রেখে তাঁর সদ্য প্রসবা কন্যাকে নিয়ে আসেন। কংস এই শিশু কন্যাকে হত্যার জন্য পাথরে নিক্ষেপ করতে গেলে সেই শিশু আকাশে উঠে গিয়ে বলে ওঠে 'তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে'। কংস গোকুলে কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য একে একে পুতনা, যমলার্জ্জুন, কেশী ইত্যাদি অসুরকে প্রেরণ করেন। কৃষ্ণ সকলকে বধ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য দেবগণ লক্ষ্মীকে প্রেরণ করলেন। তিনি সাগর ও পদ্মার ঘরে জন্ম গ্রহণ করলেন। দৈবক্রমে রাধার বিবাহ হল নপুংসক আইহনের সঙ্গে। আইহনের মা অপূর্ব সুন্দরী বধূ রাধাকে দেখা শোনার জন্য পদ্মার কাছ থেকে বড়াই নাম্নী এক বৃদ্ধাকে চেয়ে পাঠালে পদ্মা তাঁর পিসিকে পাঠালেন। ইনি সম্পর্কে রাধার ঠাকুমা।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের 'জন্মখণ্ড'-এর বিষয়বস্তু লিখুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

১.৪ তাম্বুলখণ্ডের বিষয়বস্তু

বড়াই রাধাকে নিয়ে প্রতিদিন মথুরার হাটে দৈ-দুধ বিক্রি করতে যান। একদিন রাধা তাঁর সখিদের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করতে করতে বড়াইকে ছেড়ে অনেক দূর এগিয়ে যান। বকুলতলায় এসে রাধা বড়াইকে দেখতে না পেয়ে চিন্তায় পরে যান। এদিকে বড়াইও রাধাকে হারিয়ে নানা স্থানে খুঁজতে থাকেন। অবশেষে বড়াই বৃন্দাবনের গো-পালক নাতি কৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে রাধার নিরুদ্দেশ সংবাদ জিজ্ঞাসা করলে কৃষ্ণ রাধার রূপ বর্ণনা করতে বলেন। বড়াইয়ের মুখে রাধার অপূর্ব রূপ-লাবণ্যের কথা শুনে কৃষ্ণ আর স্থির থাকতে পারলেন না। রাধাকে লাভ করার জন্য বড়াইয়ের সাহায্য কামনা করলেন এবং তাঁর হাত দিয়ে প্রেমের প্রস্তাব স্বরূপ ফুলের মালাসহ কর্পূর মিশ্রিত তাম্বুল পাঠালেন। কৃষ্ণের নির্দেশিত পথে গিয়ে রাধাকে পেয়ে বড়াইয়ের দুশ্চিন্তা দূর হল। বড়াই রাধার কাছে কৃষ্ণের প্রেম প্রস্তাব উত্থাপন করলে রাধা তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং ফুল পান মাটিতে ফেলে বাঁ পায়ে দলিত করে বললেন যে, তাঁর আইহনের মতো সুলক্ষণযুক্ত স্বামী থাকতে পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম করবেন কেন?

বড়াই কৃষ্ণের কাছে এসে এই অপমানের ঘটনা খুলে বললেন। কিন্তু তাতে অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। কৃষ্ণ, কি নিদ্রায় কি জাগরণে রাধার বিরহ জ্বালা বোধ করেন, কিছুতেই রাধাকে ভুলতে পারছেন না। পুনরায় বড়াইকে তাঁর সঙ্গে রাধার দেখা করিয়ে দেওয়ার জন্য বার বার অনুরোধ জানান। কৃষ্ণকে উপেক্ষা করতে না পেরে বড়াই আবারও রাধার কাছে এসে কৃষ্ণের ব্যাকুলতার কথা জানান। একথা শুনে রাধা বড়াইকে গালাগাল দেন এবং রেগে গিয়ে চড় মারেন। এতে বড়াই অপমানিত বোধ করেন এবং কৃষ্ণকে তার প্রতিশোধ নিতে বলেন। তাঁরই পরামর্শে কৃষ্ণ যমুনার ঘাটে দানি সেজে দান ধরবেন বলে ঠিক হয়। দানের ছলে রাধার দুধ-দৈ নষ্ট করবেন, সাতেসরী হার কেড়ে নেবেন এবং কাঁচুলি ছিঁড়বেন।

১.৫ রাধাবিরহ পর্যায়ের (খণ্ড?) বিষয়বস্তু

অনেকদিন অতিবাহিত হল রাধা আর কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পান না। কৃষ্ণের বিরহে রাধা ব্যাকুল। চৈত্র মাস এসে পড়ল। বসন্তের সমারোহে বিরহী রাধার জীবন ধারণ কঠিন হয়ে উঠল। বড়াইকে বারবার অনুরোধ করে কৃষ্ণকে এনে দেওয়ার জন্য। বড়াই রাধাকে পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, যখন কৃষ্ণ তাঁকে ভালোবেসে কাছে টানতে চেয়েছিলেন, তখন রাধা তাঁর দেওয়া ফুলের মালা, পান তাম্বুল পায়ে ফেলে দিয়েছিলেন। রাধা আরও ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, নিজের দোষের কথা স্বীকার করেন।

নাতনি রাধার দুঃখ বড়াই সহ্য করতে না পেরে বড়াই তাঁকে নিয়ে বৃন্দাবনে গেলেন। দীর্ঘ অদর্শনের পর হঠাৎ কৃষ্ণকে দেখে রাধা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তখন বড়াই ব্যস্ত হয়ে রাধার চোখেমুখে জল দিলে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং কৃষ্ণের কাছে পূর্বকৃত ভুলের জন্য ক্ষমা চান। কিন্তু রাধার কোনো অনুনয়ই কৃষ্ণ শুনতে রাজি ছিলেন না। পূর্বের প্রত্যাখ্যান ও অপমানের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন যে, তিনি অনেক কষ্টে নিজের মনকে বুঝিয়েছেন, এখন আর রাধার প্রতি তাঁর কোনো টান নেই। তবে রাধার অনুনয় শুনে তিনি বলেন যে, বড়াই যদি আদেশ দেন তাহলে তিনি তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারেন। বড়াই

অনুমতি দিলে কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে মিলিত হন। রাধা কৃষ্ণের উরুর ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে কৃষ্ণ বড়াইয়ের কাছে রাধাকে রেখে মথুরায় চলে যান। ঘুম থেকে উঠে কৃষ্ণকে দেখতে না পেয়ে রাধা আবার বিরহে কাতর হয়ে ওঠেন।

রাধার কাতরতা দেখে বড়াই কৃষ্ণকে খুঁজতে মথুরায় গেলেন। সেখানে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পেয়ে রাধার দুঃখের কথা জানালে, উত্তরে কৃষ্ণ বললেন যে, রাধার প্রতি এখন আর তাঁর মন নেই, তিনি যেন তাঁর কথা না বলেন। বড়াই কৃষ্ণের এই রকম ব্যবহার দেখে বিস্মিত হন। কৃষ্ণ জানান যে, তিনি আর বৃন্দাবনে যাবে না, ঠিক করেছেন কংসকে বধ করবেন। শেষের কিছু পৃষ্ঠা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পরের কথা আর জানা যায় না।

১.৬ কবি কৃতিত্ব

বাংলা সাহিত্যের প্রাক্ চৈতন্য যুগে অর্থাৎ মধ্যযুগের আদি পর্বে প্রথম রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক কাহিনি কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। কাব্যটিতে ভাগবত পুরাণের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাহিনির কিছুটা অনুসরণ করা হয়েছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দের বিশেষ প্রভাবকে শিরোধার্য করে সাধারণ জনগণের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক যে লৌকিক গল্প প্রচলিত ছিল, বড়ু চণ্ডীদাস সেই গল্পকে কেন্দ্র করেই গ্রাম্য অমার্জিত ভাষায় কাব্যরূপ দিয়েছেন।

ভূ-ভার হরণের জন্য ভগবান বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে এবং তার সম্ভোগের জন্য জন্য লক্ষ্মীদেবী রাধারূপে জন্মগ্রহণ করেন। পার্থিব জীবনে রাধা তাঁর পূর্ব পরিচয় ভুলে গেলেও কৃষ্ণ তা ভোলেননি। যদিও কাব্যটি রাধা-বিরহে সমাপ্ত হয়েছে, কিন্তু সাধারণত ভারতীয় সাহিত্য মিলনান্তক হয়। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায়নি, তাই এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি বড়ু চণ্ডীদাসের মৌলিক প্রতিভার পরিচায়ক। গঠনগত দিক থেকে কাব্যটি নাট্য লক্ষণাক্রান্ত, গীতিধর্মী আখ্যান। কবি কাব্যটিতে তিনটি প্রধান চরিত্র ও অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রের মাধ্যমে নাটকীয় ভঙ্গিতে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাহিনির সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। কৃষ্ণ চরিত্রটি বাদ দিলে রাধা ও বড়াই জীবনরসে উজ্জ্বল দুটি চরিত্র।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের অনেক শব্দই দুর্বোধ্য হলেও এই কাব্য এসেই বাংলা ভাষায় প্রথম সাবলীলতা লাভ করে। অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে চর্যাপদের ভাষার জড়তা কটিয়ে এই কাব্যতেই বাংলা ভাষা সাবলীল গতি লাভ করে, যা পরবর্তী সাহিত্যের পথ নির্ধারণ করেছে।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের উপমা, অলংকার ও ছন্দ ব্যবহারে কবি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সর্বোপরি বলা যায় এই কাব্যের গীতিধর্মীতা এবং বিষয়বস্তু পরবর্তী কালে বৈষ্ণব পদাবলির কবিদের বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। পরিশেষে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা যায় —"ভাষা ভঙ্গিমা, চরিত্র রূপায়ণ, বিচক্ষণতা, কাহিনির বাঁধুনি ও নাটকীয় চমৎকারিত্বের বিচারে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একটি অনন্য সাধারণ কাব্য।"

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'খ'

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কবি পরিচয় তুলে ধরুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১.৭ চরিত্র বিচার

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি একটি আখ্যানধর্মী কাব্য। এই ধরনের কাব্যে চরিত্রের ভূমিকা অপরিসীম। কারণ চরিত্রের মাধ্যমেই কাব্যের আখ্যান নির্মিত হয়। বাস্তবধর্মী সামঞ্জস্যপূর্ণ চরিত্রই কোন আখ্যানকে সফলতা দান করে। আলোচ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে তিনটি চরিত্র আছে—রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই। তবে যশোদা, সাগর, পদ্মা, আইহন, আইনহনের মাতা, কংস প্রমুখের নামের উল্লেখ থাকলেও তাঁরা প্রত্যক্ষ ভাবে কাব্যে অনুপস্থিত। তাই এখানে কেবল তিনটি চরিত্রই আলোচনা করা হল।

১.৭.১ রাধা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সব থেকে বেশি উজ্জ্বল চরিত্র হল রাধা। এই চরিত্রটিই সব থেকে বেশি জীবন্ত এবং পাঠকের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয়। রাধা নারায়ণ বা বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মীর অবতার। জন্মখণ্ডে জানা যায় কৃষ্ণের সম্ভোগের নিমিত্ত সাগর ও পদ্মার ঘরে তাঁর জন্ম। কিন্তু রাধারূপে জন্মগ্রহণের পরে তিনি তাঁর স্বরূপ সম্পর্কে বিস্মৃত ছিলেন। তাই দৈবক্রমে গোয়ালা নপুংসক আইহনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হলে আইহনের স্ত্রী হিসাবে নিজের পরিচয় দিতে এবং মানব সংসারের সামাজিকতা রক্ষায় তিনি তৎপর ছিলেন। সমাজিক মান-মর্যাদা সম্পন্ন একজন স্ত্রীর পক্ষে অপর কোনো পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা বা জড়িত হওয়া কুল-নারীর পক্ষে কলঙ্কজনক। রাধার মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়। গো-পালক কৃষ্ণ যখন বড়াইয়ের মাধ্যমে ফুল তাম্বুলসহ প্রেমের প্রস্তাব পাঠান তখন ঘৃণাভরে রাধা তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন —

"ঘরের স্বামী মোর সর্বাঙ্গ সুন্দর আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গরু রাখোআল তা সমে কি মোর নেহা।।"

একজন ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালি নারীর কাছে স্বামীই যে পরম ধন ভালোবাসার বস্তু রাধার উক্তিতে তা স্পষ্ট। এমনকি কৃষ্ণ যখন জোর করে তাঁর সঙ্গে মিলনের চেষ্টা করেন, তখনও তিনি তাঁর স্বামী আইহন ও রাজা কংসের নাম উল্লেখ করে ভয় দেখিয়েছেন—

"দুরুবার কংস নরপতী। এহা জাণী ছাড়হ বিমতী।
যবে তোরে মারিহে পরাণে। তঁবে তোক রাখিব কোন জনে।।"

কিন্তু পরবর্তী খণ্ডগুলিতে রাধা চরিত্রের এই আকাশচুম্বী প্রতিস্পর্ধী ভাব আর দেখা যায় না। রাধা প্রথম দিকে তাঁর যৌবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাই তাম্বুল খণ্ডে কৃষ্ণের পাঠানো প্রেম প্রস্তাব প্রচণ্ডভাবে

প্রত্যাখ্যান করেছেন। দান খণ্ডে নিরুপায় হয়ে রাধা কৃষ্ণের আলিঙ্গনপাশে আত্মসমর্পণ করলেও দীর্ঘক্ষণ নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে গেছেন। তবে রাধা অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই মিলনই তাঁর মনকে হয়ত কিছুটা টলিয়ে দিয়েছে। তাই তো দেখা যায়, নৌকা খণ্ডে মাঝনদীতে নৌকা ডুবিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জলকেলি করলেও সে-কথা তিনি অন্যদের কাছে গোপন করে যান। এখান থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি হয়তো আইহনের নপুংসকতা তথা নিজের যৌবন সম্পর্কে বুঝতে শুরু করেছেন। এর পর থেকে তিনি কৃষ্ণকে নিয়ে খেলতে শুরু করলেন। রাধা বুঝতে পেরেছেন, নারীসঙ্গ কামনায় একজন পুরুষ কী না করতে পারে। তাই ভার খণ্ডে আলিঙ্গনের আশা দিয়ে কৃষ্ণকে দিয়ে ভার বহন করিয়েছেন, ছত্রখণ্ডে তাঁর মাথায় ছাতা ধরিয়েছেন।

তবে এই খেলায় তিনিও কিন্তু ধীরে ধীরে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে কতটা উন্মাদ হয়ে পড়েছেন তা বোঝা যায় তাঁর এই উক্তিতে —

"কেনা বাঁশী বাএ বড়াই কালিনী নই কুলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়াই এ গোঠ গোকুলে।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদে মোর আউলাইলো রান্ধন।।"

(বংশীখণ্ড)

এবার কৃষ্ণ তাঁর কাছে অধরা। কৃষ্ণকে না পেয়ে রাধার বিরহ জ্বালার শেষ নেই। তার এই জ্বালা বৈষ্ণব পদাবলির বিরহী রাধাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিরহী রাধার উক্তি —

"এধন যৌবন বড়াই সবঈ অসার।
ছিণ্ডিয়া পেলাইবো গজ মুক্তার হার।।
মুছিয়া পেলায়িঁবো মোয়ে সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিব শংখচুর।। "

(রাধাবিরহ)

আসলে বড়ু চণ্ডীদাস রাধা চরিত্রের ক্রমবিকাশকে তুলে ধরেছেন। তাই পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী রাধা চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। রাধা ধীরে ধীরে প্রেমিকায় পরিণত হয়ে উঠেছেন। এই ক্রমবিকাশ সম্পূর্ণই মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন, প্রেম মোহ মায়ার পরিবর্তন। যা রাধা চরিত্রটিকে আরো বেশি বাস্তব মণ্ডিত ও জীবন্ত করে তুলেছে। রাধার এই বিরহ-বেদনা মানব রসে উত্তীর্ণ হয়ে ব্যক্তি বেদনায় পরিণত হয়েছে। যা সবার সীমাহীন বিরহের সুরে মিলিত হয়েছে।

১.৭.২ কৃষ্ণ চরিত্র

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের অন্যতম চরিত্র কৃষ্ণ। তাঁর নামে এ কাব্যের নামকরণ করা হলেও কৃষ্ণ চরিত্র অঙ্কনে বড়ু চণ্ডীদাসের তেমন কোন মমত্ববোধ লক্ষিত হয় না। কৃষ্ণ নামটি পৌরাণিক প্রসঙ্গের সঙ্গে

জড়িত হলেও এখানে কৃষ্ণ আগাগোড়া একটি লম্পট, দুষ্ট ও দৈহিক কামলোলুপ একটি চরিত্র মাত্র। যদিও জন্মখণ্ডে পৌরাণিক প্রসঙ্গে বলা হয়েছে কংস বধের জন্যই তাঁর জন্ম। কিন্তু সমগ্র কাব্যে তাঁর দেবমহিমা তেমন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অর্থাৎ কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'; কিন্তু 'কীর্তন' বলতে যা বোঝায়, তা কৃষ্ণ চরিত্রের পক্ষে হয়নি। বরং বলা যায় কৃষ্ণচরিত্রের দোষ-কীর্তন করা হয়েছে। তবে এই কাব্যে কীর্তন যদি কারও হয়ে থাকে তা একমাত্র রাধার।

কৃষ্ণকে প্রথম দেখা যায় তাম্বুলখণ্ডে, যখন বড়াই রাধাকে হারিয়ে তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে কৃষ্ণের কাছে পৌঁছেছেন। এই সময় বড়াইয়ের মুখে রাধার রূপ-লাবণ্যের কথা শুনে কৃষ্ণের মনে সম্ভোগ বাসনা জেগে ওঠে —"অতিশয় বাঢ়ে মোর মদনবিকার। তাত কর মোর উপকার।"

এখানে প্রেম কামাতুর নায়কের মতো শালীনতার ধার ধারেননি; প্রকৃত ভালোবাসা দানের মাধ্যমে রাধাকে পাওয়ার বাসনা কৃষ্ণ কখনওই করেননি। ছলে বলে কৌশলে যেমন করেই হোক রাধার সঙ্গে দৈহিক মিলনের প্রার্থনাই ছিল তাঁর মনের একমাত্র আকাঙ্খা। তাই দূতী রূপে বড়াইকে নিয়োজিত করেন। কিন্তু রাধা তীব্রভাবে তাঁর প্রেম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে নিজেকে অপমানিত বোধ করেন। তখন থেকে তাঁর উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়; এখন শুধু রাধাকে ভোগ করা নয়, তাঁকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে অপমানের প্রতিশোধ স্বরূপ প্রতি-প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে প্রেমের জ্বালায় জ্বালানোই কৃষ্ণের লক্ষ্য হয়ে উঠে। শুরু হয় ভোলা-ভালা রাধাকে প্রেমের জালে ফাঁসানোর প্রচেষ্টা।

প্রথম পদক্ষেপ, মথুরা ঘাটে দানি সেজে রাধার কাছে আলিঙ্গন চেয়ে বসেন এবং তাঁর অমতে জোর করে তাঁকে ভোগ করেন। এই দৈহিক মিলনের বাসনা নিয়েই কৃষ্ণ কখনো ভার বহন, কখনো মাথায় ছত্র ধারণ করতে পর্যন্ত রাজি হয়েছিলেন। এই কামনা নিয়েই কৃষ্ণ ঘাটোয়াল রূপে মাঝনদীতে নৌকা ডুবিয়ে জলের মাঝে রাধার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে ভোগ করেছেন। রাধাও ধীরে ধীরে যৌবন সম্পর্কে বুঝতে শুরু করেছেন। তাঁর স্বামী যে নপুংসক, রাধার ভরা যৌবন যে তাঁর কাছে অনুপযুক্ত, সেটা তিনি কৃষ্ণের স্পর্শ পাওয়ার পরেই বুঝতে পেরেছেন। ফলে দিন দিন তিনি একটু একটু করে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। শেষে কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী হয়ে উঠেছেন।

হৃদয়হীন কৃষ্ণ রাধার মনের এই দুর্বলতাকে কাজে লগিয়ে মনের কামনা পূর্ণ করে পূর্ব-পরিকল্পনা মতো রাধার কাছ থেকে দূরে সরে থাকা শুরু করেছেন। বড়াইয়ের কাছে রাধার আকুতির কথা শুনে কৃষ্ণ বলেছেন —"জাঁয়িতে না ফুরে মন নাম শুনি তার।" এই নির্মম উক্তি সহৃদয় পাঠকমনে কৃষ্ণের প্রতি অশ্রদ্ধা বোধেরই জাগরণ ঘটায়। বড়াইকে তিনি জানিয়েছেন যে, রাধার দিকে নজর দেওয়ার মতো এখন তাঁর সময় নেই। তিনি কংসাসুরকে বধ করবেন বলে স্থির করেছেন।

কাব্যের শুরুতে যে উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের আবির্ভাব, সেই উদ্দেশ্য সাধনে কৃষ্ণ মথুরা গমন করলেও রাধার প্রতি তাঁর এই আচরণ ক্ষমার অযোগ্য। তাই বলা যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কৃষ্ণ মানবিক গুণবর্জিত, বর্বর, দেহ লোলুপ, কুটিল চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। "গোঁয়ার-গোবিন্দ' বাগধারাটি বোধহয় কৃষ্ণের এই রূপ দেখেই তৈরি হয়েছে।

১.৭.৩. বড়াই চরিত্র

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধা কৃষ্ণের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বড়াই চরিত্রটিকে পাওয়া যায়। কখনো তিনি দূতী কখনো পরামর্শদাতা, আবার কখনো চতুর বাক-বিদগ্ধা পটীয়সী নারী।

সংস্কৃত সাহিত্যে যে কামশাস্ত্রাদির অন্তর্গত দূতী বা কুটিনী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, বড়াই চরিত্রটি তারই অনুবর্তী। রাধার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আইহনের মাতা পদ্মার কাছ থেকে বড়াইকে নিয়ে আসেন। এই বড়াই রাধার মায়ের সম্পর্কে পিসি এবং রাধার সম্পর্কে বড়াই হন। বড়াই বয়স জনিত কারণে বৃদ্ধা হলেও কপটতাপূর্ণ বাকচাতুর্যে অত্যন্ত পটু।

বড়াই নিত্য গোয়ালিনী রাধাকে সঙ্গে করে মথুরার হাটে দৈ-দুধ বিক্রি করতে যান। একদিন ফেরার পথে তিনি রাধাকে হারিয়ে খুঁজতে খুঁজতে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হন। বড়াইয়ের মুখে রাধার সৌন্দর্যের কথা শুনে কৃষ্ণ তাঁর প্রেমে পড়েন। বড়াইকে দূতী রূপে নিয়োজিত করে তাঁর হাত দিয়ে ফুল-তাম্বুল পাঠান। কৃষ্ণের এই প্রস্তাব বড়াই রাধার কাছে চতুরতার সঙ্গে ব্যক্ত করলে রাধা সমস্ত উপহার পায়ে ফেলে পদদলিত করে বড়াইকে অপমান করেন। বড়াই রাধার এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কৃষ্ণকে প্ররোচিত করেন।

বড়াইয়ের পরামর্শেই কৃষ্ণ যমুনার ঘাটে দানি সেজে রাধার সঙ্গে মিলিত হন। নৌকাখণ্ডে মাঝ নদীতে কৃষ্ণের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে রাধা হাটে যাওয়া ছেড়ে দিলেন। রাধাকে দেখতে না পেয়ে কৃষ্ণের পীড়াপীড়িতে বড়াই কৌশলে আইহনের মা'র কাছে অনুমতি নিয়ে রাধাকে পসরা সাজিয়ে হাটের পথে বের করে এনেছেন। এ পর্যন্ত বড়াই কৃষ্ণের দূতিগিরি করেছেন। পরবর্তীতে রাধা কৃষ্ণের প্রেমে পড়লে দেখা যায় তাঁরও সহায় হয়ে সঙ্গে থেকে সমস্ত রকম সহযোগিতা করেছে। তাঁরই পরামর্শে রাধা কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করে লুকিয়ে রাখেন, এমনকি ষোল'শত সখির সামনে কৃষ্ণকে হাত জোর করে, "না লঘিব রাধার বচন" বলে শপথ করিয়ে তবে বাঁশী ফেরত দিয়েছেন। আবার রাধাবিরহ অধ্যায়ে বিরহ জ্বালায় যখন রাধা কাতর তখন তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে কৃষ্ণের কাছে অনুরোধ করেছেন যেন রাধাকে ফেলে তিনি মথুরায় চলে না যান।

কৃষ্ণ ও রাধা সম্পর্কে বড়াইয়ের নাতি-নাতনি। কৃষ্ণের প্রেম-ব্যাকুলতায় তিনি যেমন তাঁর পাশে থেকেছেন, তেমনি রাধার বিরহ যন্ত্রণাতেও পাশে থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কাব্যের শুরুতে বড়াইকে কুট্টিনী ছলনাময়ী মনে হলেও কাব্যের শেষে হয়ে উঠেছেন স্নেহ, প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতায় পরিপূর্ণ এক মানবিক চরিত্র। তাই বলা যায় রাধা-কৃষ্ণের মিলন বিরহে উভয় চরিত্রের সঙ্গে বড়াই চরিত্রটিও আজীবন পাঠক হৃদয়ে সমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

১.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড ও রাধাবিরহের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিচিত হলাম।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের কবি বড়ুচণ্ডীদাসের কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের বিভিন্ন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত হতে পারলাম।

১.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

১। নং প্রশ্নের উত্তর: কংসের অত্যাচারে সৃষ্টির বিনাশ হচ্ছে।..... দেবতাদের এই মন্ত্রণা নারদ কংসকে জানালে কংস দেবকীর উদরে জন্ম হওয়া সমস্ত পুত্রকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন।..... ইনি সম্পর্কে রাধার ঠাকুমা। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'খ'

১। নং প্রশ্নের উত্তর: বাংলা সাহিত্যের প্রাক্ চৈতন্য যুগে অর্থাৎ মধ্যযুগের আদি পর্বে প্রথম রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক কাহিনি কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।..... ভূ-ভার হরণের জন্য ভগবান বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে এবং তার সম্ভোগের জন্য জন্য লক্ষ্মীদেবী রাধারূপে জন্মগ্রহণ করেন।..... কবি কাব্যটিতে তিনটি প্রধান চরিত্র ও অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রের মাধ্যমে নাটকীয় ভঙ্গিতে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাহিনির সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

১.১০ অতিরিক্ত পঠন

- ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (১৯৬৯); বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন; কলকাতা : জিজ্ঞাসা
- মুঘোপাধ্যায়, সুশীল কুমার (২০১৫, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যও তার সাংস্কৃতিক প্রক্ষাপট, কলকাতা প্রেগ্রসিভ পাবলিসার।
- রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ); শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন; কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

১.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য প্রণয়নে বড়ু চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

২। তাম্বুল খণ্ডের কাহিনি আলোচনা করুন।

৩। রাধা চরিত্র বিচার করুন।

৪। বড়াই চরিত্রের গুরুত্ব বিচার করুন।

৫। রাধা বিরহ খণ্ড প্রক্ষিপ্ত কিনা বিচার করুন।

*** *** ***